যুগান্তর

তারিখ ... 17 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকার আবুল হোসেন

পিএসসি পরীক্ষা নিয়ে বিতর্কের অবসান হোক

দেশে প্রায় ৩ কোটি শিশু স্কুলে পড়ালেখা করে। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য 'একই পদ্ধতির গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান' রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ১৯৫৪ সালে প্রথম স্তরভিত্তিক ৪র্থ শ্রেণী, ১৯৫৯ সালে পঞ্চম শ্রেণী, বর্তমান শিক্ষানীতিতে ৮ম শ্রেণী করা হয়েছে। বাস্তবায়নকাল ২০১৮ সাল পর্যন্ত ধরার কারণে সম্ভবত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য সমাপনী পরীক্ষাটি শিক্ষা আইনের মাধ্যমে পিএসসি করা হয়েছে। শিক্ষাস্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর, এরপর উচ্চশিক্ষা।

'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে' বলে অবুঝ শিশুদের ঘুমিয়ে রেখে স্বপ্ন দেখানো কোনো সভ্য জাতির জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। তাই শিক্ষার প্রাথমিক স্তরটা হওয়া চাই সমতাভিত্তিক ও সংবিধানসম্মত। কিন্তু বাস্তবে এ স্তরের শিক্ষাটা শতভাগে বিভক্ত ও শত সমস্যায় জর্জরিত। সংবিধানে 'একই পদ্ধতির' শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা থাকলেও সরকারি, বেসরকারি, ইবতেদায়ি, নুরানি, কওমি, হাফেজি, কেজি, আনন্দ, মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা, আরবি-উর্দু-ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল, এনজিও ও ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অনেক শিক্ষার্থীর জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা নেই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৩-এ বলা হয়েছে, '১. বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশু শিক্ষার্থীরা চিন্তা-চেতনায় ভিন্নতর হচ্ছে; ২. কিছু শিশুর মনে হীনম্মন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিতে পারে; ৩. কোনো শিশুর মনে দাম্ভিকতা ও অহংবোধ সৃষ্টি হতে পারে; ৪. বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের ফলে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব সৃষ্টি হতে পারে; ৫. বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের অন্তরায়।' ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত অধিকাংশ স্কুল রেজিস্ট্রেশনভুক্ত নয়। শিক্ষাকে পণ্য বানিয়ে কোচিং বাণিজ্য, প্রাইভেট টিউশন, নোটবই, গাইড বই প্রচলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে সংকোচন করে জিপিএ-৫ পাওয়ানোর হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা যেন শকুনের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ধারায় গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীরা যেন কখনোই একই পতাকার নিচে অবস্থান, এমনকি জাতীয় ইস্যুতেও ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারে সেজন্যই ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিরা এ বিচিত্র শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছে। বর্তমানে প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলগামী। তারা বিভিন্ন ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে কী শিখছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার মান সম্পর্কে জানা এবং সুকৌশলে বৈষম্য দূরীকরণার্থে শিক্ষানীতির ২নং অধ্যায়ে 'বিভিন্ন ধারার সমন্বয়', ৫নং অধ্যায়ে বর্ণিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে সব ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বাধ্যতামূলক পড়ানোর মাধ্যমে একই পদ্ধতির বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সারা দেশে একই সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নে পিএসসি পরীক্ষা নেয়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

২০০২ সালে এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার আগের বছরের তুলনায় অর্ধেকে নেমে ৩৫.৯১ শতাংশে দাঁড়ায়। একজনও পাস করেনি এমন স্কুলের সংখ্যা ছিল দুই শতাধিক। ফল বিপর্যয়ের কারণে সারা দেশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সরকারের পক্ষ থেকে এর কারণ উদঘাটনের জন্য উপ-জেলা পর্যায়ে শিক্ষক, স্কুল পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সেমিনারের আলোচনায় সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষকদের সরাসরি জড়িত থাকার চিত্র উঠে আসে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের অভিযোগ, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বাংলা-ইংরেজি হরফ শেখাতে হয়। এডুকেশন ওয়াচের গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুর ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে ৯০ শতাংশ শিক্ষকেরই কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তখন থেকেই প্রাথমিক স্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ২০০৩ ও ২০০৪ সালে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে জামালপুরে জেলাভিত্তিক পরীক্ষা নিয়ে তার একটি প্রতিবেদন তৎকালীন সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এ নিয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা জামালপুর মডেল' শিরোনামে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে পরীক্ষাটির সাফল্যের কথা তুলে ধরে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে সব জেলায় মডেল পরীক্ষা নেয়া হয়। বর্তমান সরকার প্রণীত শিক্ষানীতির ২৭নং অধ্যায়ের আলোকে ২০০৯ সালে চূড়ান্তরূপে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী এবং ২০১০ সাল থেকে জেএসসি পরীক্ষা নেয়া শুরু করে। একই সঙ্গে বৈষম্যমূলক বৃত্তি পরীক্ষা বাতিল করে বৃত্তির প্রতিযোগিতায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। ফলে এ দুটি স্তরের ভুয়া সার্টিফিকেট বিক্রি বন্ধ হওয়া এবং বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নয়ন ও শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের কথা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়; জনগণও একে স্বাগত জানায়।

২০১৪ সালে পরীক্ষা শুরুর পর একাধিক শিক্ষাবিদ অযৌক্তিক কিছু কারণ দেখিয়ে পরীক্ষাটি বন্ধের দাবি তুলছেন। যেমন— ক) সমাপনী পরীক্ষার কারণে কোচিং সেন্টারের হার বৃদ্ধি, ব্যবসার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। শিক্ষা যেখানে পণ্য সেখানে কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষা বেচাকেনার দোকান। ব্যবসায়ীরা যেখানেই মুনাফা বেশি দেখবে সেখানে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করবে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এর গতি নির্ভর করে চাহিদা ও সরবরাহের ওপর। এক্ষেত্রে সমাপনী পরীক্ষা দায়ী নয়। সমাজের এলিটরা বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার মিশেল দিয়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান বলে জায়েজ করে নিচ্ছে। কোচিং সেন্টার বৃদ্ধির কারণ— ১. মানুষের উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি; ২. কোচিং সেন্টারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকা; ৩. সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মানসম্মত শিক্ষাদানে ব্যর্থতা। তবে এ বিষয়টি সমাজের দরিদ্র-হতদরিদ্র পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য অশনিসংকেত। এক্ষেত্রে কোচিং নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগে সরকারের হস্তক্ষেপ খুবই জরুরি।

খ) পরীক্ষা ভীতি : ডিজিটালের এ যুগে ১২/১৩ বছরের শিশুরা পরীক্ষা দিতে ভয় পায়, এমন ধারণা কতটা যৌক্তিক? কারণ যে বয়সে আমরা কাপড় পরতাম না, ওই বয়সের শিশুরা আজ ল্যাপটপে খেলছে, মোবাইলে কথা বলছে। মহাকবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ শিশু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, Pygmy in size giant in thought.— 'আকৃতিতে ক্ষুদে কিন্তু চিন্তায় দৈত্য'। ২০০১ সালে ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বিশ্বের শিশুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রত্যেক শিশুর মস্তিষ্কে ১০ হাজার কোটি কোষ আছে। এই অসংখ্য কোষ নিজেদের মধ্যে নানা ঢঙে প্রতিস্থাপিত হয়ে লাখ লাখ গুণ বেশি অবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মানব শিশুর মস্তিষ্কের কোষগুলো শিশুর তিন বছর বয়সেই সক্রিয় হয়। সেহেতু এ বয়সেই শিশুর জীবনের ধারা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলো পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। নান্দনিক পরিবেশে শিশুদের যোগ্য করে গড়ে তোলার এটাই মোক্ষম সময়। তাছাড়া এ পরীক্ষাটির কারণে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা বেড়েছে এবং শিক্ষার্থীদের অলসতা দূর করে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। শতবর্ষের পুরনো কেন্দ্রীয়ভাবে নেয়া বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে পিএসসি পরীক্ষা শিশুর শৈশব জীবনের একটি পরীক্ষা উৎসবই শুধু নয়, অধিকন্তু শিশুরা এর মাধ্যমে একটি মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করে নিজেরা গর্ববোধ করছে।

গ) সময় ও অর্থের অপচয় : পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করলে বৃত্তি পরীক্ষায় যখন কমবেশি ১০ লাখ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে, তখনও সময় ও অর্থ ব্যয় হবে। তবে শিক্ষা খাতে এ ব্যয়কে খরচ বা অপচয় না বলে বিনিয়োগ বলাই শ্রেয়।

ঘ) পিএসসিতে দুর্নীতি ঢুকেছে : গত দু'বছরের টিআইবি রিপোর্টে শিক্ষা বিভাগ দুর্নীতিতে ১ম ও ২য় স্থানে ছিল। তাই দুর্নীতির বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা দুর্নীতির কারণে সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করতে বলেছেন। বিষয়টি 'দুর্ঘটনার ভয়ে রাস্তায় বের না হওয়া'র মতো! তিনি এও বলেছেন, বিশ্বের কোনো দেশে অষ্টম শ্রেণীর আগে পাবলিক পরীক্ষা নেই। কথাটি সত্য। তবে সেসব দেশে কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বৈষম্যযুক্ত প্রাথমিক স্তরও নেই। স্বাধীনতার পরপরই প্রণীত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষানীতির ৭নং অধ্যায়ের ৭.৫ অনুচ্ছেদে ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের মেয়াদ ৮ বছর করার সুপারিশ ছিল। তিনিও তো সরকারের দায়িত্বে ছিলেন। স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরেও কেন তার বাস্তবায়ন হয়নি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক তার মেয়ের পরীক্ষার খাতায় অতিরিক্ত নম্বর দিয়ে জিপিএ-৫ পাইয়ে দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনিও পরীক্ষাটি বাতিলের জন্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। অর্থাৎ যেখানেই দুর্নীতি সেখানেই বন্ধ! তারা যদি 'রুখো দুর্নীতি বাঁচাও শিক্ষা-শিক্ষার্থী' এ স্লোগান সামনে নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিতেন, তাহলে দেশবাসী তাদের পাশে দাঁড়াত, আন্দোলন বেগবান হতো, জাতিও উপকৃত হতো। তবে পরীক্ষাটি বন্ধের দাবির পেছনে বিশেষ কোনো মহলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি-না, সরকার ও জনগণকে তা গভীরভাবে ভাবতে হবে! পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার হলে স্বজনপ্রীতি, খাতা মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশে দুর্নীতির দায় শুধু পিএসসি পরীক্ষার ওপরই চাপানো হচ্ছে। ২০১৮ সালের পর জেএসসি পরীক্ষা যখন পিএসসিতে রূপান্তরিত হবে, তখন এমনিতেই অতিরিক্ত এ পরীক্ষাটি বন্ধ হয়ে যাবে। তার আগেই সরকার দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে এ পরীক্ষা বন্ধ করবে কি-না এ প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু গত ২১ জুন যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদে এবং সম্প্রতি টিআইবি রিপোর্টে দুর্নীতিবাজদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ায় সে শংকাটি কেটে গেছে। কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরীক্ষা চলার সময় থেকে ফল প্রকাশ পর্যন্ত গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে সিসি ক্যামেরার ব্যবহার নিশ্চিত করে দুর্নীতিবাজদের শনাক্ত করা— এসব ভালো পদক্ষেপ। কিন্তু দুর্নীতিবাজদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করে যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এতে দুর্নীতি রোধ নয়, বরঞ্চ এক জেলা থেকে অন্য জেলায় চালান করে দুর্নীতি আরও বাড়ানো হচ্ছে। উপজেলাগুলোর দু'-একজন দুর্নীতিবাজ শিক্ষক-কর্মচারী-কর্মকর্তা চার বছরের কারাদণ্ডসহ চাকরি হারালে দুর্নীতি সহজেই বন্ধ হবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। তাই দুর্নীতি রোধে সরকারকে আরও কঠোর ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সরকার আবুল হোসেন : *জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৩ প্রাপ্ত শিক্ষাবিষয়ক গবেষক, লেখক ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী, ঢাকা বিভাগ*